জনসাধারণের জন্য সহজ বাংলায় তাওহীদ শিক্ষা

তাওহীদ অর্থ একত্ববাদ, আল্লাহর এককত্ব এবং সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর একক কর্তৃত্ব। প্রভুত্বে, ইবাদতে, পবিত্র নামসমূহ ও গুণাবলীতে আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তার কোন শরীক তথা অংশীদার নেই এবং তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই। সংক্ষিপ্ত আকারে এই হলো তাওহীদ।

তাওহীদের গুরুত্ব ও ফযিলত

গুরুত্বঃ দুনিয়া ও আখিরাতে সবকিছুর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তাওহীদ। তাওহীদের ভিত্তিতেই দুনিয়ার জীবনে নির্ধারিত হয় কে মু'মিন এবং কে কাফির। তাওহীদের ভিত্তিতেই মহান আল্লাহ ফয়সালা করবেন কে চিরস্থায়ী জান্নাতি এবং কে চিরস্থায়ী জাহান্নামি। জগৎ ও জীবন সৃটির মূল লক্ষ্যই হচ্ছে তাওহীদ বাস্তবায়ন। মানুষ ও জ্বীন সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ যাবতীয় সমস্ত আনুগত্য তথা ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়া। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও আনুগত্য তথা ইবাদাতে লিপ্ত না হওয়া। পবিত্র কুরআন ও হাদিছের অসংখ্য জায়গায় তাওহীদের আলোচনা এসেছে। এই পৃথিবীতে নবী ও রসূলগণ প্রেরণের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর নির্দেশিত তাওহীদকে প্রত্যেক জাতির নিকট পৌছে দেয়া। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তরবারীসহ প্রেরণ করা হয়েছে আল্লাহর জমিনে এই তাওহীদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেনঃ "আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতির নিকট একজন করে রসূল প্রেরণ করেছি এই নির্দেশ পৌছে দেয়ার জন্য যে, তোমরা (একমাত্র) আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তাগূতকে বর্জন করো।" – [সূরা আন-নাহল, আয়াতঃ ৩৬]

ফযিলতঃ তাওহীদের ফযিলত অপরিসীম। যে ব্যক্তি মৃত্যু পর্যন্ত তাওহীদের উপর অটল-অবিচল থাকবে, তার চিরস্থায়ী ঠিকানা জান্নাত। এই পৃথিবীতে তাওহীদকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে যারা আল্লাহর পথে সশস্ত্র যুদ্ধ তথা জিহাদ করে এবং নিহত হয়, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর সন্তুষ্ট হন এবং তাদেরকে শহীদের মর্যাদা দান করেন। আখিরাতে তারা বিশেষ মর্যাদা লাভ করবে এবং তাদের চিরস্থায়ী সুখের আবাসস্থল হবে জান্নাত। আর এটিই মহাসফলতা। দুনিয়া ও আখিরাতে তাওহীদের ফযিলতগুলো হলোঃ **১.** তাওহীদ হলো সত্যের আহবান। **২.** তাওহীদ হলো রক্তের হিফযতকারী এবং দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপত্তা প্রদানকারী। **৩.** তাওহীদ হলো জান্নাতের চাবি। **৪.** তাওহীদের কালিমা সর্বশ্রেষ্ট নেক আমল। **৫.** তাওহীদের কালিমা সর্বশ্রেষ্ঠ জিকির। **৬.** তাওহীদের কারণেই গুণাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয় ইত্যাদি।

কালিমাতুশ শাহাদাহ
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদূর রসূলুল্লাহ
আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর (প্রেরিত) রসূল।

'কালিমাতুশ শাহাদাহ' এর দুইটি অংশঃ

১. প্রথম অংশঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ – আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই – এই অংশকে বলা হয় 'তাওহীদের কালিমা'।

২. দ্বিতীয় অংশঃ মুহাম্মাদূর রসূলুল্লাহ – মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর (প্রেরিত) রসূল – এই অংশকে বলা হয় 'রিসালাতের কালিমা'।

একজন ব্যক্তিকে মুসলিম হতে হলে সর্বপ্রথম তাকে 'কালিমাতুশ শাহাদাহ' পাঠের মাধ্যমে 'তাওহীদ ও রিসালাত' - উভয় অংশের সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে।

তাওহীদের কালিমা
'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'

তাওহীদের কালিমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর দুইটি রুকন তথা দুইটি মূলভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই দুইটির যেকোন একটি বাদ পড়লে তা কখনই তাওহীদ হিসেবে সাব্যস্ত হবে না। আর তাওহীদ না থাকলে, ঈমানও কবুল হবে না।

১. প্রথম রুকনঃ 'লা-ইলাহা' – 'নেই কোন (সত্য) ইলাহ' – এই সাক্ষ্য দ্বারা এক আল্লাহ ব্যতীত সমস্ত মিথ্যা ও বাতিল ইলাহদের অস্বীকার করা, তাদের আনুগত্য তথা ইবাদাতকে বর্জন করা এবং তাদের ও তাদের অনুসারীদের প্রতি চিরশত্রুতা ও ঘৃণা পোষণ করা। কেননা, তারা প্রত্যেকেই কাফির, মুশরিক ও মুরতাদ। - এই প্রক্রিয়াটির নাম 'কুফর বিত্ তৃগূত' তথা 'তাগূতকে অস্বীকার করা'।

২. দ্বিতীয় রুকনঃ 'ইল্লাল্লাহ' – 'আল্লাহ ছাড়া' – এই সাক্ষ্য দ্বারা এক আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ ঈমান আনা, একমাত্র আল্লাহকে সত্য ইলাহ হিসেবে বিশ্বাস করা এবং যাবতীয় সমস্ত আনুগত্য তথা ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা। - এই প্রক্রিয়াটির নাম 'ঈমান বিল্লাহ' তথা 'আল্লাহর উপর ঈমান'।

অতএব, আল্লাহর উপর ঈমান আনার পূর্বশর্ত হলো সমস্ত তাগূতকে বর্জন করা। 'কুফর বিত্ তৃগূত' তথা 'তাগূতকে অস্বীকার করা' ব্যতীত 'ঈমান বিল্লাহ' তথা 'আল্লাহর উপর ঈমান' আনার দাবি কখনই আল্লাহর নিকট গ্রহনযোগ্য হবে না।

তাগূত

প্রশ্ন হলো, তাগূত কী? তাগূত হলোঃ আল্লাহর পরিবর্তে কিংবা আল্লাহর সাথে অংশীদার করে যার আনুগত্য তথা ইবাদাত করা হয় এবং যে এই আনুগত্য তথা ইবাদাতে সন্তুষ্ট থাকে, তাকে তাগূত বলে। তাগূত অর্থ সীমালংঘনকারী। তাগূত দৃশ্য-অদৃশ্য ব্যক্তি ও বস্তু উভয়ই হতে পারে। তাগূত হলো আল্লাহর অবাধ্য ও বিরোধী অপশক্তি। তাগূত ইসলামের বড় শত্রু। রসূলুল্লাহ ﷺ এর দাওয়াত ও জিহাদের মূল লক্ষ্যই ছিলো তাগূত নির্মূল করা এবং তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা।

অসংখ্য প্রকারের তাগূত রয়েছে। বিশেষ কয়েক প্রকার তাগূত হলোঃ

১. শয়তানঃ শয়তান বান্দাকে আল্লাহর পরিবর্তে নিজের এবং অন্যের আনুগত্য তথা ইবাদাতে লিপ্ত করে, তাই শয়তান হলো তাগূত।

২. প্রবৃত্তিঃ প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা বান্দাকে আল্লাহর অবাধ্য করে। ফলে, বান্দা আল্লাহর পরিবর্তে নিজ প্রবৃত্তি-পূজায় লিপ্ত হয়। তাই প্রবৃত্তি হলো তাগূত।

৩. শাসকঃ সেসমস্ত শাসক তাগূত, যারা আল্লাহর নাযিলকৃত শরী'আহ আইনের পরিবর্তে অন্য আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করে। আইন তথা বিধান দেয়া একমাত্র আল্লাহর এখতিয়ার। এটি লংঘন করে তারা নিজেরা আইন প্রণয়ন করার শিরকে লিপ্ত হয় এবং আল্লাহর সাথে নিজেদেরকে শরীক তথা অংশীদার করে। প্রশাসন সেসব মানব রচিত আইন জনগণের উপর প্রয়োগ করে। যারা এসমস্ত আইন ও বিধানের আনুগত্য করে তারা সুস্পষ্ট শিরকে লিপ্ত। কেননা, এই আনুগত্য তথা ইবাদাতের মাধ্যমে তারা আল্লাহর সাথে শরীক তথা অংশীদার করে এবং তাদের শাসককে আইনপ্রণেতা তথা বিধানদাতা হিসেবে গ্রহণ করে।

৪. বিচারকঃ সেসমস্ত বিচারক তাগূত, যারা আল্লাহর নাযিলকৃত শরী'আহ আইনের পরিবর্তে অন্য আইন দিয়ে বিচার-ফয়সালা করে। আদালতও একটি তাগূত। কেননা, এখানে আল্লাহর নাযিলকৃত শরী'আহ আইনের পরিবর্তে অন্য আইন দিয়ে বিচার-ফয়সালা চলে। আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দিয়ে বিচার-ফয়সালা না করা সুস্পষ্ট কুফরি। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, "আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দিয়ে যারা বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই কাফির." – [সূরা মায়েদা, আয়াতঃ ৪৪]। আর এসকল মানবরচিত বিধান দ্বারা পরিচালিত আদালত ও বিচার-ফয়সালার দারস্থ হওয়া সুস্পষ্ট শিরক। মহান আল্লাহ বিচার-ফয়সালার জন্য তাগূতের নিকট যাওয়াকে হারাম করেছেন।

৫. সংসদঃ সংসদ বা পার্লামেন্ট একটি তাগূত। কেননা, এখানে আল্লাহর আইন ও বিধানকে পরিবর্তন কিংবা পরিবর্ধন করে অথবা বাদ দিয়ে নতুন আইন তথা সংবিধান প্রণয়ন করা হয় যা সুস্পষ্টভাবে পবিত্র কুরআনের সাথে কুফরি এবং মহান আল্লাহর সাথে শিরক। অতএব, মানব রচিত সংবিধানও একটি তাগূত। সংসদ হলো এমন একটি জায়গা যেখানে এর সদস্যরা সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে আল্লাহর বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। অধিকাংশ সংসদ সদস্যদের মতামত বা ভোটে আল্লাহর হারাম করা বিষয়কে হালাল করা হয় অর্থাৎ বৈধতা দেয়া হয়। এইভাবে তারা আল্লাহর আইন ও বিধানকে পরিবর্তন করে বড় শিরক ও কুফরিতে লিপ্ত হয়। আর যারা শিরক ও কুফরিতে লিপ্ত তারা মুশরিক ও কাফির।

৬. সার্বভৌমত্বের দাবিদারঃ সার্বভৌমত্বের দাবিদার ব্যক্তি বা শাসক হলো তাগূত। কেননা, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। তিনি ছাড়া আর কারও সার্বভৌমত্ব নেই। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, "আসমান ও যমীনের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহরই।" [সূরা আলে-ইমরান, আয়াতঃ ১৮০] একইভাবে, সকল ক্ষমতার উৎস একমাত্র আল্লাহ। শাসক কিংবা জনগণ কখনই সকল ক্ষমতার উৎস হতে পারে না। অথচ, কুফরী গণতন্ত্র বা ডেমোক্রেসির মুলকথা হলো 'শাসক কিংবা জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস'। যে কেউ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের সার্বভৌমত্বের দাবিকে মেনে নিবে সে কাফির ও মুশরিক।

এছাড়াও অদৃশ্য কিংবা ভবিষ্যৎ জানার দাবিদার, মিথ্যা 'ইলাহ' দাবিদার, জাদুকর, পীর-মাজার, তাবিজ-কবচ, মূর্তি-ভাস্কর্য, বাপ-দাদার অন্ধ-অনুসরণ ইত্যাদি হলো তাগূত। ঈমানদার হওয়ার পূর্বশর্ত হলো তাগূতকে অস্বীকার করা।

'কুফর বিত্ তৃগূত' তথা তাগূতকে অস্বীকার করার ৩টি উপায়

১. অন্তর দ্বারা - তাগূতকে অস্বীকার করাঃ এর অর্থ হলো, অন্তর থেকে তাগূতকে অবিশ্বাস করা, তাগূতের প্রতি আনুগত্য তথা ইবাদাতকে বর্জন করা এবং তাগূত ও তার অনুসারী কাফির, মুশরিক ও মুরতাদদের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা। তাদের প্রতি চিরশত্রুতা ও ঘৃণা বজায় রাখা।

২. জবান দ্বারা - তাগূতকে অস্বীকার করাঃ এর অর্থ হলো, বক্তব্য দ্বারা তাগূতকে অস্বীকার করা, তাগূতের প্রতি আনুগত্য তথা ইবাদাত বর্জনের আহবান করা এবং তাগূত ও তার অনুসারীদের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দেয়া। তাদের বিরোধিতা করা এবং তাদের শিরক ও কুফরির ব্যাপারে মানুষদের সতর্ক করা।

৩. আমল দ্বারা - তাগূতকে অস্বীকার করাঃ এর অর্থ হলো, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা তাগূতকে অস্বীকার করা। সকল প্রকার আনুগত্য তথা ইবাদাত থেকে তাগূতকে বর্জন করা এবং তাগূত নির্মূলের জন্য সর্বাত্মক লড়াই অব্যাহত রাখা। এটি হলো তাগূতকে অস্বীকার করার চূড়ান্ত পদ্ধতি। জীবিত তাগূতকে কোন প্রকার উপকার না করা এবং তাগূত থেকে কোনভাবেই উপকৃত না হওয়া। তাগূত শাসকের আইন, বিধান ও শাসনকার্যকে বাতিল বলে গণ্য করা এবং তাগূত বিচারক ও আদালতের নিকট কোনো প্রকার বিচার নিয়ে যাওয়া থেকে বিরত থাকা। তাগূত ও তার অনুসারীদের নির্মূল করে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর একত্ববাদ তথা তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, "যারা ঈমানদার তারা লড়াই করে আল্লাহর পথে, আর যারা কাফির (মুশরিক, মুরতাদ, মুনাফিক) তারা লড়াই করে তাগূতের পথে। সুতরাং তোমরা লড়াই কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল।" [সূরা আন-নিসা, আয়াতঃ ৭৬]

তাওহীদের প্রকারভেদ

‘ঈমান বিল্লাহ’ তথা ‘আল্লাহর উপর ঈমান’ তাওহীদের ৩টি প্রকারকে অন্তর্ভূক্ত করে। অর্থাৎ, তাওহীদের ৩টি প্রকারের উপর পরিপূর্ণরূপে ঈমান আনা আবশ্যক। কোনো একটি প্রকারের উপর ঈমান না আনলে তা ‘ঈমান বিল্লাহ’ হিসেবে সাব্যস্ত হবে না। তাওহীদের ৩টি প্রকার এবং এগুলোর পরিচয় হলোঃ

১. তাওহীদ আল রুবুবিয়্যাহ - প্রভুত্বে আল্লাহ একঃ সৃষ্টি করা, রিজিক দেয়া, পরিচালনা করা, বিধান দেয়া, সার্বভৌমত্ব, গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখা, জীবন-মৃত্যু দান করা ইত্যাদি সকল কাজ সম্পাদনকারী একমাত্র আল্লাহ। তিনি ছাড়া এই কাজগুলো সম্পাদন করতে আর কেউ সক্ষম নয়। সকল প্রভুত্বের কাজে আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক বা অংশীদার নেই। বান্দা এই বিশ্বাসকে অন্তরে পোষণ করবে এবং মৌখিক স্বীকারোক্তি দিবে।

২. তাওহীদ আল উলুহিয়্যাহ - ইবাদাতে আল্লাহ একঃ আল্লাহর পরিবর্তে কিংবা আল্লাহর সাথে অংশীদার করে যত তাগূতের আনুগত্য তথা ইবাদাত করা হয়, সমস্ত তাগূতকে অস্বীকার করা। অতঃপর, সমস্ত আনুগত্য তথা ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা। একমাত্র আল্লাহর আইন, বিধান ও জীবনব্যবস্থা মেনে চলা এবং আনুগত্য তথা ইবাদাতে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক বা অংশীদার না করা। বান্দা এই বিশ্বাসকে অন্তরে পোষণ করবে, মৌখিক স্বীকারোক্তি দিবে এবং আমল তথা কাজে বাস্তবায়ন করবে।

৩. তাওহীদ আল আসমা ওয়াস্ সিফাত - পবিত্র নামসমূহ ও গুণাবলীতে আল্লাহ একঃ কোনো ধরণের বিকৃতি সাধন (তাহরীফ), নিষ্ক্রিয় করণ (তা’তীল) এবং সাদৃশ্য প্রদান (তামছীল) ছাড়াই পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদিছে বর্ণিত আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ ও গুণাবলী একমাত্র আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা। সুন্দর নামসমূহ ও গুণাবলী দ্বারা আল্লাহর নিকট দু’আ করা। সুন্দর নামসমূহ ও গুণাবলীতে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক বা অংশীদার না করা। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “তাঁর (আল্লাহর) সদৃশ (অনুরূপ) কোনো কিছু নেই। তিনি (আল্লাহ) সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।“ [সূরা শূরা, আয়াতঃ ১১]

তাওহীদ আল হাকিমিয়্যাহ

হুকুম তথা আইন ও বিধান প্রণয়ন এবং শাসন ও বিচার-ফয়সালা প্রদানে আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তার কোনো শরীক বা অংশীদার নেই এবং তিনি ব্যতীত বিধান দেয়ার তথা আইন প্রণয়নের এখতিয়ার কারও নেই। অতএব, আল্লাহই একমাত্র বিধানদাতা। তিনিই একমাত্র আইন প্রণয়নকারী। মানুষ কখনই বিধানদাতা কিংবা আইন প্রণেতা হতে পারে না। কারণ, মানুষকে সেই যোগ্যতা বা ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়নি। সৃষ্টির জন্য আইন ও বিধান প্রদানের একমাত্র যোগ্য মালিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। অতএব, ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্ব একমাত্র আল্লাহর দেয়া আইন ও বিধান দিয়েই চলবে। এটিই ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশনা। এই নির্দেশনা লঙ্ঘন করে আইন ও বিধান প্রদানের ভার আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কারো হাতে ছেঁড়ে দিলে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্ব সর্বক্ষেত্রেই বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় নেমে আসে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, “হুকুম (আইন, বিধান) দেয়ার একমাত্র মালিক আল্লাহ। তিনি (আল্লাহ) আদেশ করেছেন, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো (আইন ও বিধানের) আনুগত্য করবে না। এটাই সঠিক দ্বীন (ইসলামী জীবনব্যবস্থা), কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।“ [সূরা ইউসুফ, আয়াতঃ ৪০] “তিনি (আল্লাহ) নিজ হুকুমে (সৃষ্টিজগতের জন্য আইন ও বিধান প্রণয়নে) কাউকে শরীক করেন না।“ [সূরা কাহাফ, আয়াতঃ ২৬] “জেনে রাখো, সৃষ্টি যার হুকুম (আইন ও বিধান) চলবে একমাত্র তার।“ [সূরা আ’রাফ, আয়াতঃ ৫৪]

আল ওয়ালা ওয়াল বারা

‘ইসলামে বন্ধুত্ব ও শত্রুতার নীতিমালা’ যা একমাত্র তাওহীদের ভিত্তিতেই গঠিত হয়। ওয়ালা অর্থ বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা এবং বারা অর্থ শত্রুতা ও ঘৃণা। ইসলামে বন্ধুত্ব ও শত্রুতার নীতিমালা ৩ টি। যথাঃ ১. আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ঈমানদারদের প্রতি নিখাঁদ বন্ধুত্ব ও আন্তরিক ভালোবাসা পোষণ করা একমাত্র তাদের ঈমানের জন্য। ২. আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাফির ও মুশরিকদের প্রতি চিরশত্রুতা ও ঘৃণা বজায় রাখা একমাত্র তাদের কুফরি ও শিরকের জন্য। ৩. গুণাহগার মুসলিমদেরকে তাদের গুনাহের জন্য ঘৃণা করা এবং তাদের ঈমানের জন্য তাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা। এছাড়াও তাগূত ও তার অনুসারী কাফির, মুশরিক ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে লড়াই করা, মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সহযোগিতা না করা, তাদেরকে সহযোগী বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করা, তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ না করা, তাদের আচার-আচরণে আকৃষ্ট না হওয়া, তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ না করা, তাদের অনুকরণ ও অনুসরণ না করে চলা ইত্যাদি। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, “মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল এবং তার সাথী-সাহাবীগণ কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর এবং মু'মিনদের প্রতি অত্যন্ত কোমল।“ [সূরা ফাতহ, আয়াতঃ ২৯] “হে ঈমানদারগণ, তোমরা ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না, তারা (অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টানরা) একে অপরের বন্ধু (সহযোগী)। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে (অর্থাৎ তাদের সহযোগী হবে) নিশ্চয়ই সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে (অর্থাৎ সেও কাফির ও বে-ঈমান হবে); নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সঠিক পথ (হিদায়াত) প্রদর্শন করেন না।“ [সূরা মায়েদা, আয়াতঃ ৫১] “আপনি সকল মানুষের মধ্যে ঈমানদার মুসলিমদের প্রতি অধিক শত্রুতাপোষণকারী পাবেন ইহুদি ও মূর্তিপূজারী মুশরিকদের।“ [সূরা মায়েদা, আয়াতঃ ৮২] “হে মু'মিনগণ, তোমরা ঈমানদার মুসলিম ছাড়া অন্য কাউকে (কাফিরদেরকে) অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা (কাফিররা) তোমাদের সর্বনাশ করতে ত্রুটি করবে না। তারা তোমাদের মারাত্মক ক্ষতি কামনা করে। তাদের মুখ থেকে তো শত্রুতা প্রকাশ পেয়ে গিয়েছে। আর তাদের অন্তরে যা কিছু গোপন আছে তা আরও অধিক ভয়ংকর। আমি তোমাদের কাছে তাদের লক্ষণগুলো স্পষ্ট করে দিলাম, যদি তোমরা অনুধাবন কর।“ [সূরা আলে-ইমরান, আয়াতঃ ১১৮] “হে ঈমানদারগণ, তোমাদের মধ্য হতে কেউ তার দ্বীন (ইসলাম) হতে ফিরে গেলে, অচিরেই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায়কে নিয়ে আসবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারাও তাকে ভালবাসবে, তারা মু’মিনদের প্রতি হবে কোমল আর কাফিরদের প্রতি হবে কঠোর, তারা আল্লাহর পথে জিহাদ (যুদ্ধ) করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবে না।“ [সূরা মায়েদা, আয়াতঃ ৫৪]

মিল্লাতে ইব্রাহীম

নবী ইব্রাহীম (‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মিল্লাত তথা দ্বীন ইসলাম, যা পরিপূর্ণরূপে তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত। একমাত্র তাওহীদের ভিত্তিতেই শুধু কুফর ও শিরককে প্রত্যাখ্যান নয়, বরং তাগূত ও তার অনুসারী কাফির, মুশরিক ও মুরতাদদেরকেও প্রত্যাখ্যান করা, তাদের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং তাদের প্রতি চিরশত্রুতা ও বিদ্বেষ বজায় রাখার ক্ষেত্রে ‘মিল্লাতে ইব্রাহীম’ এর আদর্শ অনুসরণ করা। যে আদর্শের ব্যাপারে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, “নিশ্চয়ই ইব্রাহীম ও তার অনুসারীদের মাঝে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা যখন তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, ‘তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের আনুগত্য কর তাদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের অস্বীকার (প্রত্যাখ্যান) করলাম। তোমাদের ও আমাদের মাঝে তৈরী হলো শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো’।“ [সূরা মুমতাহিনা, আয়াতঃ ৪]

তাওহীদের শর্তসমূহঃ দুই প্রকার

প্রথম প্রকারঃ দুনিয়াতে নিরাপত্তাজনিত ২টি শর্তঃ ১. কালিমা শাহাদাহ পাঠ করা এবং এর স্বীকারোক্তি প্রদান করা ২. তাওহীদ বিনষ্টকারী কোন কিছু না থাকা। **দ্বিতীয় প্রকারঃ** পরকালে মুক্তির জন্য ৭টি শর্তঃ **১. ইল্ম - জ্ঞানঃ** তাওহীদের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান থাকা। **২. ইয়াকিন - দৃঢ় বিশ্বাসঃ** তাওহীদের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা। **৩. কবুল - গ্রহণঃ** তাগূতকে বর্জন করা এবং তাওহীদকে গ্রহণ করা। **৪. ইনকিয়াদ - আত্মসমর্পণঃ** তাওহীদের প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করা। **৫. সিদক - সত্যবাদিতাঃ** সত্যবাদিতার সাথে তাওহীদের সাক্ষ্য প্রদান করা। **৬. ইখলাস - একনিষ্ঠতাঃ** একনিষ্ঠতার সাথে তাওহীদ মেনে চলা **৭. মুহাব্বাহ - ভালোবাসাঃ** তাওহীদ ও তার অনুসারীদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা।

তাওহীদ ভঙ্গের কারণসমূহ

অধিকাংশ মুসলিম ওযু ও সালাত ভঙ্গের কারণগুলো জানেন কিন্তু তাওহীদ ও ঈমান ভঙ্গের কারণগুলো জানেন না। এমন কিছু বিশ্বাস, কথা ও কাজ রয়েছে, যার কারণে একজন মুসলিমের তাওহীদ ও ঈমান ভেঙ্গে যায় এবং সে দ্বীন ইসলাম থেকে বের হয়ে মুরতাদ ও কাফির হয়ে যায়। নাওয়াকিদুত তাওহীদ বা নাওয়াকিদুল ঈমান তথা তাওহীদ ও ঈমান ভঙ্গের কারণগুলো হলোঃ

১. আল্লাহর একত্ববাদ তথা প্রভুত্বে কিংবা ইবাদাতে অথবা নামসমূহ ও গুণাবলীতে আল্লাহর সাথে কোনো সৃষ্টিকে শরীক তথা অংশীদার করা। ২. আল্লাহ ও বান্দার মাঝে কোনো সৃষ্টিকে ‘মাধ্যম’ বানানো এবং তার কাছে প্রার্থনা করা, শাফা’আত কামনা করা, তার উপর ভরসা করা। ৩. কাফির-মুশরিকদের ‘কাফির’ মনে না করা, তাদের শিরক ও কুফরির ব্যাপারে সন্দেহ থাকা কিংবা তাদের ধর্ম ও মতাদর্শকে সত্য মনে করা। ৪. রসূল ﷺ এর আদর্শের চেয়ে অন্য কারো আদর্শকে পরিপূর্ণ মনে করা অথবা তার বিচার-ফয়সালার পরিবর্তে তাগূতের বিচার-ফয়সালাকে উত্তম বলে গ্রহণ করা। ৫. রসূল ﷺ এর আনীত ইসলামের কোনো আইন ও বিধানকে অপছন্দ করা, যদিও সে ঐ বিধানের উপর আমল করে, তবুও সে কাফির। ৬. মহান আল্লাহ, দ্বীন ইসলামের কোনো বিষয়, পবিত্র কুরআনের কোনো আয়াত অথবা নবী মুহাম্মাদ ﷺ কে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ বা কটুক্তি করা। ৭. জাদু করা, জাদুর আশ্রয় নেয়া অথবা জাদুর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। ৮. মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সমর্থন ও সহযোগিতা করা। ৯. মুহাম্মাদ ﷺ এর আনীত ইসলামী শরী'আহ মেনে চলা আবশ্যক নয় অথবা এই শরী'আতের বাইরে থাকার অবকাশ আছে (যেভাবে খিজির আ. নবী মুসা আ. এর আনীত শরী’আতের বাইরে ছিলেন) - এমন বিশ্বাস পোষণ করা। ১০. আল্লাহর মনোনিত দ্বীন ইসলামকে উপেক্ষা করে চলা কিংবা ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ে থাকা অথবা দ্বীন ইসলামের জ্ঞান শিক্ষা না করা এবং অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল না করা।

রিসালাতের কালিমা
‘মুহাম্মাদূর রসূলুল্লাহ’

রিসালাতের কালিমা ‘মুহাম্মাদূর রসূলুল্লাহ’ এর সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে ‘মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর (প্রেরিত) বান্দা ও রসূল’ - এই অংশের স্বীকারোক্তি প্রদান করা হয়। রিসালাতের কালিমার ২টি রুকনঃ ১. রিসালাতের স্বীকৃতি এবং ২. আল্লাহর বান্দা হওয়ার স্বীকৃতি। রিসালাতের কালিমার ৪টি দাবি বা শর্তঃ ১. রসূল ﷺ এর আনীত সকল সংবাদকে সত্যায়ন করা। ২. তাঁর নির্দেশ মেনে চলা। ৩. তাঁর নিষেধকৃত বিষয় পরিহার করা। ৪. তাঁর দেখানো পদ্ধতিতে আল্লাহর ইবাদাত করা।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এটি তাওহীদের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা, যা পূর্ণাঙ্গ নয়। এই মূল্যবান কাগজটি কোথাও না ফেলে - নিজে পড়ুন এবং অন্যকেও পড়তে দিন।